ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ২য় পত্র: ফিকহুল মুআশারাহ ও মুসলিম পারিবারিক আইন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Questions)

গ্রন্থ পরিচিতি

১৬. যে কিতাবের শরাহ (ব্যাখ্যা) আল-হাসকাফী করেছেন, সে মূল কিতাবটির (মতন) নাম কী? (ما هو اسم متن الكتاب الذي شرحه الحصكفي؟)

১৭. 'রদ্দুল মুহতার' কি উসূলুল ফিকহের (ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতি) কিতাব, নাকি ফুরুউল ফিকহের (শাখা গত মাসআলার) কিতাব? (هل يعتبر رد المحتار من كتب الفروع أم الأصول؟)

১৮. 'আদ দুররুল মুখতার' কিতাবের গ্রন্থকার কে? (من هو مؤلف كتاب الدر المختار؟)

১৯. জ্ঞানগত পরিভাষায় 'হাশিয়া' শব্দটির অর্থ কী? (ما معنى مصطلح "الحاشية" في الاصطلاح العلمي؟)

২০. কিতাবটির নাম 'রদ্দুল মুহতার' রাখার কারণ কী? (ما هو سبب تسمية الكتاب بـ رد المحتار؟)

২১. ইবনে আবিদীন তার হাশিয়াতে যে নতুন উদ্ভূত মাসয়ালাগুলো উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর বিধান কী? (ما هو حكم المسائل المستحدثة التي أوردها ابن عابدين في حاشيته؟)

২২. মাসআলাসমূহে নির্ভুলতা যাচাই করা ছাড়া হাশিয়াটির অন্য একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। (اذكر إحدى ميزات الحاشية غير التدقيق في المسائل)

২৩. ইবনে আবিদীন একা হাশিয়াটি রচনা করেছেন, নাকি অন্য কেউ তা সম্পন্ন করেছেন? (هل قام ابن عابدين بتأليف الحاشية بمفرده أم أكملها غيره؟)

২৪. সাধারণত কত খণ্ডে কিতাবটি মুদ্রিত হয়েছে? (كم عدد الأجزاء التي طبع فيها الكتاب في الغالب؟) ২৫. ইবনে আবিদীনের যে কিতাবটি ফাতওয়ায়াল হামিদিয়ার পরিমার্জন (তানক্বীহ) হিসেবে গণ্য, তার নাম কী? (ما اسم كتاب ابن عابدين الذي يعد تنقيحا للفتاوى الحامدية؟)

২৬. 'রদ্দুল মুহতার'-এর সাথে 'কুররাতুল উয়ুনিল আখইয়ার' কিতাবের সম্পর্ক কী? (ما هي علاقة قرة عيون الأخيار بكتاب رد المحتار؟)
২৭. ইবনে আবিদীন শুধু পূর্ববর্তী হানাফি কিতাবসমূহের ওপর নির্ভর করেছিলেন, নাকি অন্য কিতাবের ওপরও? (هل اعتمد ابن عابدين على كتب الحنفية السابقة فقط أم غيرها؟)
২৮. বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার একটি উপকারিতা উল্লেখ কর। (اذكر فائدة واحدة لحاشية ابن عابدين في مجال القضاء)
২৯. হাশিয়াতে দলীল ও যৌক্তিকতা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য কী? (ما هي الغاية من ذكر الأدلة والتعليلات على الحاشية؟)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর : গ্রন্থ পরিচিতি

১৬. যে কিতাবের শরাহ (ব্যাখ্যা) আল-হাসকাফী করেছেন, সে মূল কিতাবটির (মতন) নাম কী? (ما هو اسم متن الكتاب الذي شرحه الحصكفي؟)

হানাফি ফিকহের অন্যতম নির্ভরযোগ্য এবং প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ হলো 'আদ-দুররুল মুখতার'। এই মহান গ্রন্থটি মূলত একটি সংক্ষিপ্ত মূল পাঠ্য বা 'মতন'-এর ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। আল্লামা আলাউদ্দিন আল-হাসকাফী (রহ.) যেই মূল কিতাবটির ব্যাখ্যা হিসেবে এটি রচনা করেছেন, তার নাম হলো 'তানভিরুল আবসার' (تنوير الأبصار)।

এই মূল কিতাব বা মতনটির পূর্ণ নাম হলো 'তানভিরুল আবসার ওয়া জামিউল বিহার'। এর রচয়িতা হলেন শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-গাজ্জী আত-তিমুরতাশি (রহ.)। তিনি হিজরি একাদশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত ফকিহ ছিলেন। 'তানভিরুল আবসার' কিতাবটি হানাফি ফিকহের জগতে অত্যন্ত সমাদৃত একটি গ্রন্থ। এর বিশেষত্ব হলো, লেখক এতে ফিকহের হাজার হাজার মাসআলাকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, সারগর্ভ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। এটি এতটাই বরকতময় ও গ্রহণযোগ্য ছিল যে, তৎকালীন সময়ের ছাত্ররা এটি মুখস্ত করত এবং ফতোয়া দেওয়ার সময় এর ওপর নির্ভর করত।

আল্লামা হাসকাফী (রহ.) এই কিতাবটির গুরুত্ব অনুধাবন করে এর একটি চমৎকার ব্যাখ্যাগ্রন্থ বা শরাহ লেখার সিদ্ধান্ত নেন, যা পরবর্তীতে 'আদ-দুররুল মুখতার' নামে খ্যাতি লাভ করে। মূলত 'তানভিরুল আবসার'-এর ইবারত বা বাক্যগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত হওয়ায় সাধারণের জন্য তা বোঝা কঠিন ছিল। হাসকাফী

(রহ.) তার শরাহতে সেই সংক্ষিপ্ত শব্দগুলোর মর্মার্থ খুলে দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় মাসআলা সংযোজন করেছেন। ফিকহের ছাত্ররা জানে যে, 'তানভিরুল আবসার' হলো সেই ভিত্তিপ্রস্তর, যার ওপর 'দুররুল মুখতার' এবং পরবর্তীতে 'রদ্দুল মুহতার'-এর মতো বিশাল ইমারত গড়ে উঠেছে। সুতরাং, হানাফি ফিকহের সিলসিলায় এই মতনটির গুরুত্ব অপরিসীম।

১৭. 'রদ্দুল মুহতার' কি উসূলুল ফিকহের (ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতি) কিতাব, নাকি ফুরুউল ফিকহের (শাখা গত মাসআলার) কিতাব? (هل يعتبر رد المحتار من كتب الفروع أم الأصول؟)

আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'রদ্দুল মুহতার' মূলত 'ফুরুউল ফিকহ' (فروع الفقه) বা ফিকহশাস্ত্রের শাখা-প্রশাখা ও মাসআলা বিষয়ক একটি কিতাব। এটি 'উসূলুল ফিকহ' বা ফিকহের মূলনীতি বিষয়ক কিতাব নয়।

ইসলামি শরিয়তে ইলমে ফিকহ দুই ভাগে বিভক্ত: এক. উসূলুল ফিকহ (মূলনীতি), যেখানে কুরআন ও হাদিস থেকে মাসআলা বের করার নিয়মকানুন শেখানো হয় (যেমন— 'নুরুল আনওয়ার' বা 'উসূলুশ শাশী')। দুই. ফুরুউল ফিকহ (প্রয়োগিক মাসআলা), যেখানে দৈনন্দিন জীবনের ইবাদত, লেনদেন ও হালাল-হারামের সুনির্দিষ্ট বিধান আলোচনা করা হয়। 'রদ্দুল মুহতার' এই দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

এই কিতাবে লেখক পবিত্রতা (তাহারাত), নামাজ, রোজা থেকে শুরু করে বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার এবং বিচার ব্যবস্থা পর্যন্ত মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের খুঁটিনাটি সমাধান দিয়েছেন। যদিও এটি ফুরুউল ফিকহের কিতাব, তবুও ইমাম ইবনে আবিদীন এতে প্রাসঙ্গিকভাবে প্রচুর উসূল বা মূলনীতির আলোচনা করেছেন। যখনই তিনি কোনো জটিল মাসআলার সমাধান দিয়েছেন, তখনই তিনি হানাফি মাযহাবের মূলনীতি বা 'কাওয়ায়েদ' উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, কেন এই রায়টি দেওয়া হলো। অর্থাৎ, এটি ফুরুউল ফিকহের কিতাব হলেও এতে উসূলের প্রয়োগ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ঘটেছে। মুফতি ও ফকিহগণ ফতোয়া প্রদানের জন্য সরাসরি এই কিতাবের মাসআলাগুলো ব্যবহার করেন, নিয়মকানুন শেখার জন্য নয়। তাই এর পরিচয় হলো এটি হানাফি মাযহাবের 'ফতোয়া' বা 'ফুরু' বিষয়ক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দানকারী গ্রন্থ।

১৮. 'আদ-দুররুল মুখতার' কিতাবের গ্রন্থকার কে? (من هو مؤلف كتاب الدر المختار؟)

হানাফি ফিকহের অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং নির্ভরযোগ্য কিতাব 'আদ-দুররুল মুখতার'-এর রচয়িতা হলেন আল্লামা আলাউদ্দিন আল-হাসকাফী (রহ.)। তার পূর্ণ নাম হলো মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-হিসনি, যিনি 'আলাউদ্দিন আল-হাসকাফী' নামে মশহুর।

তিনি ১০২৫ হিজরি সনে সিরিয়ার দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৮৮ হিজরি সনে সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন তার যুগের শ্রেষ্ঠ ফকিহ, মুহাদ্দিস এবং ভাষাবিদ। তিনি দীর্ঘকাল দামেশকের মুফতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং হানাফি মাযহাবের ফতোয়া বিভাগের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার পাণ্ডিত্য ও তাকওয়া ছিল সর্বজনবিদিত।

'আদ-দুররুল মুখতার' হলো তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এটি মূলত 'তানভিরুল আবসার' নামক কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। হাসকাফী (রহ.) এই কিতাবটি রচনার ক্ষেত্রে এক অনন্য এবং বিস্ময়কর শৈলী অবলম্বন করেছেন। তিনি সাগরের মতো বিশাল ইলমকে ছোট পেয়ালার মতো সংক্ষিপ্ত শব্দে ধারণ করেছেন। তার লেখার ভাষা অত্যন্ত সাহিত্যমণ্ডিত, সংক্ষিপ্ত এবং ইঙ্গিতবহ। তিনি খুব অল্প কথায় অনেক বেশি ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, যাকে আরবিতে 'ইজাজ' বলা হয়। তার এই কিতাবটি এতটাই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল যে, তার জীবদ্দশাতেই এটি বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং ফিকহের ছাত্র-শিক্ষকদের হাতে হাতে পৌঁছে যায়। তবে অতিরিক্ত সংক্ষেপায়নের কারণে কিছু জায়গায় অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছিল, যা পরবর্তীতে আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার 'রদ্দুল মুহতার' বা হাশিয়ার মাধ্যমে দূর করেছেন।

১৯. জ্ঞানগত পরিভাষায় 'হাশিয়া' শব্দটির অর্থ কী? (ما معنى مصطلح "الحاشية" في الاصطلاح العلمي؟)

ইলমি বা জ্ঞানগত পরিভাষায় 'হাশিয়া' (الحاشية) বলতে এমন একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থকে বোঝায়, যা কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থের (শরাহ) ওপর লেখা হয়। অর্থাৎ, মূল কিতাব বা 'মতন'-এর ওপর যে ব্যাখ্যা লেখা হয় তাকে বলে 'শরাহ', আর সেই শরাহ বা ব্যাখ্যার ওপর যদি আরও কোনো টীকা-টিপ্পনী বা বিশ্লেষণ লেখা হয়, তবে তাকে বলা হয় 'হাশিয়া'।

আভিধানিক অর্থে হাশিয়া মানে হলো— কিনারা, পার্শ্বদেশ বা বর্ডার। প্রাচীনকালে যখন কিতাব লেখা হতো, তখন মূল লেখাটি পৃষ্ঠার মাঝখানে থাকত এবং চারপাশের ফাঁকা জায়গায় (মার্জিনে) ছাত্ররা বা গবেষকরা ছোট ছোট নোট লিখতেন। এই নোটগুলোকেই হাশিয়া বলা হতো। কালক্রমে এই নোটগুলো যখন বড় আকার ধারণ করল এবং পৃথক বই হিসেবে সংকলিত হলো, তখন সেগুলোর নাম হয়ে গেল হাশিয়া।

'রদ্দুল মুহতার' হলো এমনই একটি হাশিয়া। কারণ এর মূল টেক্সট হলো 'আদ-দুররুল মুখতার', যা নিজেই একটি শরাহ (তানভিরুল আবসারের)। ইমাম ইবনে আবিদীন 'দুররুল মুখতার'-এর বক্তব্যগুলোকে আরও পরিষ্কার করার জন্য, ভুলভ্রান্তি শুধরানোর জন্য এবং দলিলগুলো বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য এই হাশিয়াটি রচনা করেন। ফিকহের পরিভাষায় হাশিয়া হলো গবেষণার সর্বোচ্চ স্তর। কারণ যিনি হাশিয়া লেখেন, তাকে মতন ও শরাহ উভয়ের ওপর পূর্ণ দখল রাখতে হয়। হাশিয়াতে সাধারণত খুব সূক্ষ্ম ও গভীর আলোচনা থাকে, যা সাধারণ পাঠকদের জন্য নয়, বরং বিশেষজ্ঞ আলেমদের জন্য লেখা হয়।

২০. কিতাবটির নাম 'রদ্দুল মুহতার' রাখার কারণ কী? (ما هو سبب تسمية الكتاب بـ رد المحتار؟)

আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার এই কালজয়ী গ্রন্থটির নাম রেখেছেন 'রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার' (رَدُّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ)। এই নামকরণের পেছনে একটি গভীর তাৎপর্য ও চমৎকার কারণ রয়েছে।

আরবিতে 'রদ্দ' (رَدّ) শব্দের অর্থ হলো ফিরিয়ে দেওয়া, উত্তর দেওয়া বা সমাধান দেওয়া। আর 'মুহতার' (مُحْتَار) শব্দের অর্থ হলো পেরেশান, দিশেহারা বা বিভ্রান্ত ব্যক্তি। যিনি সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছেন না বা সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না, তাকে মুহতার বলা হয়।

মূলত 'আদ-দুররুল মুখতার' কিতাবটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও জটিল ভাষায় লেখা ছিল। অনেক ক্ষেত্রে এর ইবারত বা বাক্য পড়ে পাঠক ও মুফতিরা বিভ্রান্ত হতেন। তারা বুঝতে পারতেন না যে লেখক আসলে কী বোঝাতে চেয়েছেন বা মাসআলার সঠিক হুকুমটি কী। আবার কিছু জায়গায় দুর্বল মত উল্লেখ থাকায় ফতোয়া দিতে গিয়ে মুফতিরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যেতেন।

ইমাম ইবনে আবিদীন তার এই কিতাবের মাধ্যমে সেই সমস্ত পেরেশান ও দিশেহারা মুফতিদের সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। তিনি জটিল বাক্যগুলোর সহজ ব্যাখ্যা করেছেন এবং দুর্বল মতগুলো চিহ্নিত করে সঠিক মতটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই রূপক অর্থে তিনি বুঝিয়েছেন: "যে ব্যক্তি ফিকহের সমুদ্রে পথ হারিয়ে পেরেশান (মুহতার), এই কিতাব তাকে হাত ধরে সঠিক গন্তব্যে ফিরিয়ে আনবে (রদ্দ)।" অর্থাৎ, এটি বিভ্রান্তি দূরকারী ও প্রশান্তি দানকারী গ্রন্থ। এই নামকরণের সার্থকতা কিতাবটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় ফুটে উঠেছে।

২১. ইবনে আবিদীন তার হাশিয়াতে যে নতুন উদ্ভূত মাসয়ালাগুলো উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর বিধান কী? (ما هو حكم المسائل المستحدثة التي أوردها ابن عابدين في حاشيته؟)

ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার 'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে কেবল প্রাচীন মাসআলাগুলোই সংকলন করেননি, বরং তার যুগে উদ্ভূত হাজারো নতুন সমস্যার (নাওয়াজিল) সমাধানও দিয়েছেন। এই নতুন মাসআলাগুলো তার ফিকহী প্রজ্ঞা ও ইজতিহাদ বা গবেষণার ফসল।

এই মাসআলাগুলোর বিধান বা হুকুম হলো— এগুলো হানাফি মাযহাবের চূড়ান্ত ও নির্ভরযোগ্য ফতোয়া হিসেবে গণ্য। পরবর্তী যুগের সকল হানাফি ফকিহ ও মুফতি একমত যে, ইবনে আবিদীন যে সমাধান দিয়েছেন, তা মাযহাবের উসুল বা মূলনীতির আলোকেই দিয়েছেন। তাই তার দেওয়া সমাধানগুলো কোনো ব্যক্তিগত মত নয়, বরং এগুলোই মাযহাবের সিদ্ধান্ত।

উদাহরণস্বরূপ, তার সময়ে ঘড়ির প্রচলন, নতুন ধরণের মুদ্রাব্যবস্থা, তামাক সেবন এবং ব্যবসায়িক লেনদেনের নতুন কিছু পদ্ধতি চালু হয়েছিল। পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে এগুলোর সরাসরি কোনো হুকুম ছিল না। ইবনে আবিদীন তার গভীর জ্ঞান দিয়ে কিয়াস (Analogy) ও ইস্তিহসানের মাধ্যমে এগুলোর শরয়ী বিধান বের করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে উরফ বা প্রথার পরিবর্তনের কারণে ফিকহী হুকুম কীভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। তার এই ইজতিহাদী ক্ষমতা তাকে 'মুজাদ্দিদ' বা সংস্কারকের আসনে বসিয়েছে। ভারত উপমহাদেশ, তুরস্ক, মিশর এবং আরবের আলেমগণ আজ পর্যন্ত নতুন কোনো সমস্যা দেখা দিলে আগে দেখেন যে, শামীতে এ সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত আছে কি না। তার রায়কে আদালতের রায়ের মতো মান্য করা হয়।

২২. মাসআলাসমূহে নির্ভুলতা যাচাই করা ছাড়া হাশিয়াটির অন্য একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। (اذكر إحدى ميزات الحاشية غير التدقيق في المسائل)

'রদ্দুল মুহতার' বা ফতোয়া শামীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো মাসআলার নির্ভুলতা যাচাই বা 'তাহকীক'। কিন্তু এটি ছাড়াও এই কিতাবের আরও অনেক অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তার মধ্যে একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো— 'দলিল ও কারণ দর্শানো' (ইকামাতুদ দালাইল ওয়াত-তালিল)।

সাধারণত ফতোয়ার কিতাবগুলোতে বা হাশিয়াগুলোতে কেবল মাসআলার হুকুম (জায়েজ/নাজায়েজ) বলা থাকে, কিন্তু কেন জায়েজ বা কেন নাজায়েজ, তা বিস্তারিত বলা থাকে না। ইবনে আবিদীন এই ধারার পরিবর্তন করেছেন। তিনি যখনই কোনো মাসআলা উল্লেখ করেছেন, সাথে সাথে কুরআন, হাদিস, ইজমা বা কিয়াস থেকে তার শক্তিশালী দলিল পেশ করেছেন। তিনি শুধু দলিল দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং হুকুমের পেছনের যৌক্তিক কারণ বা 'ইল্লত'ও ব্যাখ্যা করেছেন।

যেমন, কোনো একটি কাজ মাকরুহ হলে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন—কেন এটি মাকরুহ? এর দ্বারা কী ক্ষতি হতে পারে? শরিয়তের কোন মাকসাদ বা উদ্দেশ্য এতে ব্যাহত হচ্ছে? এই বৈশিষ্ট্যটি কিতাবটিকে কেবল ফতোয়ার কিতাব নয়, বরং ফিকহী গবেষণার এক বিশাল এনসাইক্লোপিডিয়ায় পরিণত করেছে। এর ফলে একজন ছাত্র বা মুফতি কেবল হুকুম জানেন না, বরং হুকুমের উৎস ও রহস্য সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করতে পারেন। এটি তাকে ভবিষ্যতে নতুন মাসআলা বের করার যোগ্যতা দান করে। এছাড়া 'মুফতা বিহি' বা ফতোয়াযোগ্য মতটি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে দেওয়াও এর আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য।

২৩. ইবনে আবিদীন একা হাশিয়াটি রচনা করেছেন, নাকি অন্য কেউ তা সম্পন্ন করেছেন? (هل قام ابن عابدين بتأليف الحاشية بمفرده أم أكملها غيره؟)

'রদ্দুল মুহতার' বা ফতোয়া শামী কিতাবটির সিংহভাগ বা মূল অংশ ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) একাই রচনা করেছেন। তিনি তার জীবনের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত এই কিতাবটি লেখার কাজে নিমগ্ন ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন; কিতাবটি পুরোপুরি শেষ করার আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন। ফলে কিতাবের শেষদিকের কিছু অংশ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

তার ইন্তেকালের পর তার সুযোগ্য পুত্র এবং প্রধান ছাত্র আল্লামা আলাউদ্দিন ইবনে আবিদীন (রহ.) এই মহান দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। তিনি তার পিতার রেখে যাওয়া পাণ্ডুলিপিগুলো গুছিয়ে নেন এবং যে অধ্যায়গুলো লেখা বাকি ছিল, সেগুলো পিতার উসুল ও পদ্ধতি অনুসরণ করে সমাপ্ত করেন। পুত্রের লেখা এই অংশটির আলাদা নাম হলো 'কুররাতুল উয়ুনিল আখইয়ার' (قرة عيون الأخيار)।

সুতরাং, উত্তর হলো—ইবনে আবিদীন কিতাবটি শুরু করেছেন এবং অধিকাংশ লিখেছেন, কিন্তু তা সম্পন্ন বা 'তাকমিল' করেছেন তার ছেলে। বর্তমানে ছাপানো কপিতে এই দুটি অংশই একসাথে পাওয়া যায়। সাধারণত 'কিতাবুল ইজারাহ' (ভাড়া পর্ব) বা তার পরবর্তী কিছু অংশ থেকে ছেলের লেখা শুরু হয়েছে। তবে ছেলের লেখা অংশটিও এতটাই মানসম্মত যে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে বোঝা কঠিন যে লেখক পরিবর্তিত হয়েছে। এভাবেই পিতা ও পুত্রের যৌথ প্রচেষ্টায় হানাফি মাযহাবের এই বিশাল সম্পদটি পূর্ণতা লাভ করেছে।

২৪. সাধারণত কত খণ্ডে কিতাবটি মুদ্রিত হয়েছে? (كم عدد الأجزاء التي طبع فيها الكتاب في الغالب؟)

'রদ্দুল মুহতার' বা ফতোয়া শামী একটি বিশাল কলেবরের গ্রন্থ। এর খণ্ড সংখ্যা বিভিন্ন প্রকাশনী এবং ছাপার পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য সংস্করণগুলোতে এটি সাধারণত ৫ (পাঁচ) বা ৬ (ছয়) বিশাল খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে।

সবচেয়ে প্রসিদ্ধ 'বুলাক' (মিশরীয়) সংস্করণে এটি ৫টি মোটা ভলিউমে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে পাকিস্তানের এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানি এবং লেবাননের দারুল ফিকর ও দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত আধুনিক সংস্করণগুলোতে পৃষ্ঠাসজ্জা এবং টীকা সংযোজনের কারণে খণ্ড সংখ্যা আরও বেড়েছে। আধুনিক কোনো কোনো সংস্করণে এটি ১২ থেকে ১৫ খণ্ডেও পাওয়া যায়।

তবে মাদরাসার ছাত্র ও আলেমদের কাছে '৫ খণ্ডের শামী' বা '৮ খণ্ডের শামী' কথাটিই বেশি প্রচলিত। প্রতিটি খণ্ডে হাজার হাজার মাসআলা স্থান পেয়েছে। সাধারণত প্রথম খণ্ডে ইবাদত (তাহারাত, সালাত), মাঝের খণ্ডগুলোতে মুআমালাত ও নিকাহ-তালাক এবং শেষের খণ্ডগুলোতে অন্যান্য বিবিধ বিষয় আলোচিত হয়েছে। কিতাবের বিশালতা দেখে বোঝা যায়, লেখক কী পরিমাণ

পরিশ্রম ও গবেষণা করেছেন। বর্তমানে ডিজিটাল যুগে এটি সিডি বা অ্যাপ আকারেও পাওয়া যায়, কিন্তু ছাপানো কিতাবের খণ্ডগুলোই লাইব্রেরির শোভা ও আলেমদের গর্ব।

২৫. ইবনে আবিদীনের যে কিতাবটি ফাতওয়ায়াল হামিদিয়ার পরিমার্জন (তানক্বীহ) হিসেবে গণ্য, তার নাম কী? (ما اسم كتاب ابن عابدين الذي يعد تنقيحا للفتاوى الحامدية؟)

ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) কেবল 'রদ্দুল মুহতার'ই লিখেননি, তিনি পূর্ববর্তী অনেক কিতাবের সংস্কার ও পরিমার্জনও করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো 'আল-উকুদুদ দুররিয়্যাহ ফি তানকিহিল ফাতাওয়াল হামিদিয়্যাহ' (العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية)।

মূল কিতাব 'ফাতওয়া হামিদিয়্যাহ' রচনা করেছিলেন মুফতি হামিদুদ্দিন আল-ইমাদি (রহ.)। এটি হানাফি ফতোয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব ছিল, কিন্তু এতে মাসআলাগুলো কিছুটা অগোছালো ছিল এবং কিছু জায়গায় দুর্বল বা অপ্রচলিত মত উল্লেখ করা হয়েছিল। ইবনে আবিদীন এই কিতাবটিকে নতুন করে ঢেলে সাজান। তিনি দুর্বল মতগুলো বাদ দিয়ে সেখানে শক্তিশালী ও 'মুফতা বিহি' (ফতোয়াযোগ্য) মতগুলো সংযোজন করেন। ফতোয়ার ভাষাগুলো আরও সহজ ও প্রাঞ্জল করেন এবং প্রয়োজনীয় দলিল-প্রমাণ যুক্ত করেন।

তার এই কাজের ফলে কিতাবটির গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণ বেড়ে যায়। বিচারক ও মুফতিরা এই পরিমার্জিত সংস্করণটির ওপর বেশি আস্থা রাখতে শুরু করেন। এই কিতাবটি প্রমাণ করে যে, ইবনে আবিদীন কেবল একজন লেখক ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন দক্ষ সম্পাদক ও সংস্কারক। তিনি জানতেন কীভাবে একটি পুরনো হীরাকে ঘষেমেজে আরও উজ্জ্বল করা যায়।

২৬. 'রদ্দুল মুহতার'-এর সাথে 'কুররাতুল উয়ুনিল আখইয়ার' কিতাবের সম্পর্ক কী? (ما هي علاقة قرة عيون الأخيار بكتاب رد المحتار؟)

'রদ্দুল মুহতার'-এর সাথে 'কুররাতুল উয়ুনিল আখইয়ার' (قرة عيون الأخيار)-এর সম্পর্ক হলো 'আসল' (মূল) ও 'তাকমিলা' (পরিশিষ্ট বা সমাপ্তি)-এর সম্পর্ক।

'রদ্দুল মুহতার' হলো ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.)-এর লেখা মূল কিতাব, যা তিনি মৃত্যুর আগে শেষ করে যেতে পারেননি। আর 'কুররাতুল উয়ূনিল আখইয়ার' হলো তার ছেলে আল্লামা আলাউদ্দিন ইবনে আবিদীন (রহ.)-এর লেখা সেই কিতাবেরই বাকি অংশ। অর্থাৎ, যেখানে পিতার কলম থেমে গিয়েছিল, সেখান থেকে পুত্র কলম ধরেছেন এবং কিতাবটি শেষ করেছেন।

প্রকাশকরা যখন 'রদ্দুল মুহতার' ছাপান, তখন তারা এই দুটি কিতাবকে আলাদা করেন না। বরং মূল কিতাবের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ছেলের লেখা অংশটি শেষে জুড়ে দেন। তাই এটি একটি অখণ্ড গ্রন্থের মতোই মনে হয়। 'কুররাতুল উয়ুন' মানে হলো 'নয়নমণি' বা 'চোখের শীতলতা'। আলাউদ্দিন ইবনে আবিদীন সম্ভবত এই নাম দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, তার পিতার এই অসমাপ্ত কাজটি সমাপ্ত করা তার জন্য চোখের শীতলতা এবং গর্বের বিষয়। ইলমি মানের দিক থেকেও দুটি অংশের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই, কারণ পুত্র পিতার কাছেই ইলম ও লেখার পদ্ধতি শিখেছিলেন। সুতরাং, এদের সম্পর্ক হলো—একই দেহের দুই অংশের মতো, একটি ছাড়া অন্যটি অসম্পূর্ণ।

২৭. ইবনে আবিদীন শুধু পূর্ববর্তী হানাফি কিতাবসমূহের ওপর নির্ভর করেছিলেন, নাকি অন্য কিতাবের ওপরও? (هل اعتمد ابن عابدين على كتب الحنفية السابقة فقط أم غيرها؟)

ইমাম ইবনে আবিদীন তার 'রদ্দুল মুহতার' রচনার সময় কেবল হানাফি মাযহাবের পূর্ববর্তী ফতোয়ার কিতাবগুলোর ওপরই নির্ভর করেননি, বরং তার গবেষণার পরিধি ছিল আরও অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত।

অবশ্যই তার মূল ভিত্তি ছিল হানাফি মাযহাবের মৌলিক কিতাবসমূহ—যেমন 'হেদায়া', 'আল-মাবসুত', 'ফাতহুল কাদির', 'বাহরুর রায়েক', 'বাদায়েউস সানায়ে' এবং 'ফতোয়া হিন্দিয়া'। তিনি এই কিতাবগুলোর নির্যাস বের করেছেন।

কিন্তু এর পাশাপাশি তিনি নির্ভর করেছেন:

১. হাদিস ও তাফসিরের কিতাব: দালিলিক প্রমাণের জন্য তিনি সিহাহ সিত্তাহসহ হাদিসের বিশাল ভাণ্ডার এবং তাফসির গ্রন্থগুলো ব্যবহার করেছেন।

২. আরবি ভাষা ও অভিধান: কোনো শব্দের সঠিক অর্থ ও প্রয়োগ বোঝার জন্য তিনি 'কামুস', 'সিহাহ' ইত্যাদি অভিধানের সহায়তা নিয়েছেন।

৩. অন্যান্য মাযহাবের কিতাব: তুলনামূলক ফিকহ বা 'ফিকহুল মুকারান' আলোচনার জন্য তিনি শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের কিতাবগুলোও দেখেছেন। বিশেষ করে যখন হানাফি মাযহাবে কোনো সমস্যার সমাধান পাওয়া যেত না (যেমন নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রীর বিধান), তখন তিনি অন্য মাযহাবের কিতাব থেকে সহায়তা নিতেন।

৪. তাসাউফ ও আধ্যাত্মিক কিতাব: আদব ও আখলাকের বিষয়গুলোতে তিনি সুফী সাধকদের কিতাব থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

সুতরাং, তিনি ছিলেন বহুমুখী জ্ঞানের এক বিশাল লাইব্রেরি। তিনি সংকীর্ণমনা ছিলেন না, বরং সত্য ও সঠিক সমাধান যেখানে পেয়েছেন, সেখান থেকেই গ্রহণ করেছেন, তবে অবশ্যই হানাফি উসুল ঠিক রেখে।

২৮. বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার একটি উপকারিতা উল্লেখ কর। (اذكر فائدة واحدة لحاشية ابن عابدين في مجال القضاء)

বিচার বিভাগ বা 'কাজা' (Judiciary)-এর ক্ষেত্রে ইমাম ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার সবচেয়ে বড় উপকারিতা হলো— 'চূড়ান্ত রায় প্রদানের মানদণ্ড নির্ধারণ'।

বিচারক বা কাজীরা যখন কোনো মামলার রায় দিতে যান, তখন তাদের সামনে বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন রকম মত থাকে। কোনো কিতাবে বলা আছে 'বৈধ', আবার কোনোটিতে 'অবৈধ'। এমতাবস্থায় বিচারকরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন যে কোন মতের ওপর ভিত্তি করে রায় দেবেন। ইবনে আবিদীনের হাশিয়া এই সমস্যার সমাধান দিয়েছে।

তিনি তার কিতাবে প্রতিটি মতভেদের শেষে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন: "ওয়াল ফাতওয়া আলাইহি" (এর ওপরই ফতোয়া) অথবা "ওয়া বিহি ইউফতা" (এর দ্বারাই ফতোয়া দেওয়া হয়)। বিচারকদের জন্য তার এই সিদ্ধান্তই হলো শেষ কথা। উসমানীয় খেলাফতের সময় সরকারিভাবে নির্দেশ ছিল যে, আদালতে ইবনে আবিদীনের কিতাব অনুযায়ী রায় দিতে হবে। এমনকি আধুনিককালেও বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের পারিবারিক আদালতগুলোতে মুসলিম আইনের ব্যাখ্যায় বিচারকরা 'ডি.এফ. মোল্লা'র পাশাপাশি 'ফতোয়া শামী'কে অথেনটিক রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণ করেন। এটি বিচারকদের সময় বাঁচায় এবং ভুল রায়

দেওয়া থেকে বিরত রাখে। তার কিতাবটি বিচারকদের জন্য একটি 'রেডি রেফারেন্স' বা সংবিধানের মতো কাজ করে।

২৯. হাশিয়াতে দলীল ও যৌক্তিকতা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য কী? (ما هي الغاية من ذكر الأدلة والتعليلات على الحاشية؟)

ইমাম ইবনে আবিদীন তার হাশিয়াতে প্রতিটি মাসআলার সাথে কুরআন-সুন্নাহর দলিল (নকলি দলিল) এবং যৌক্তিক কারণ (আকলি দলিল) উল্লেখ করেছেন। এর পেছনে তার মহৎ কিছু উদ্দেশ্য ছিল:

১. মাযহাবের ভিত্তি মজবুত করা: অনেকেই মনে করত হানাফি মাযহাব কেবল যুক্তি বা 'রায়'-এর ওপর ভিত্তি করে চলে। ইবনে আবিদীন দলিল দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, হানাফি ফিকহের প্রতিটি মাসআলা সরাসরি কুরআন ও হাদিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটি মাযহাব বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতে সাহায্য করেছে।

২. মুফতিদের ইজতিহাদি যোগ্যতা বৃদ্ধি: তিনি শুধু মাছ দেননি, মাছ ধরা শিখিয়েছেন। দলিল ও ইল্লত (কারণ) জানার ফলে একজন মুফতি বুঝতে পারেন যে, কেন এই হুকুম দেওয়া হলো। পরবর্তীতে যদি পরিস্থিতি বা ইল্লত পরিবর্তন হয়, তবে মুফতি নিজেই নতুন হুকুম বের করতে পারেন।

৩. মনের প্রশান্তি: দলিল জানলে আমলকারীর মনে প্রশান্তি আসে। সে বুঝতে পারে যে সে আল্লাহর হুকুমই পালন করছে, কোনো মানুষের মনগড়া কথা নয়।

৪. শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ: মতভেদের ক্ষেত্রে হানাফি মতটি যে অন্য মাযহাবের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ও যুক্তিযুক্ত, তা প্রমাণ করার জন্যও তিনি বিস্তারিত দলিল পেশ করেছেন। তার এই প্রচেষ্টার ফলে হানাফি ফিকহ জ্ঞানগতভাবে অনেক বেশি সমৃদ্ধ ও আধুনিক হয়েছে।